নামায

কায়েম কর

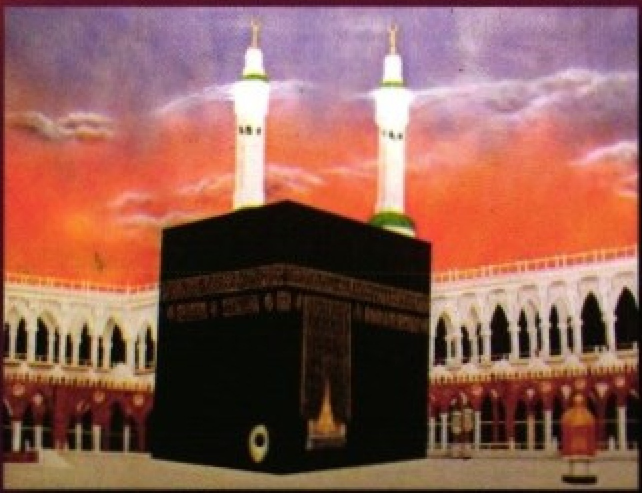

অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন

নামায কায়েম কর

অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.amarboi.org

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্স এণ্ড সার্কুলেশন :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

গ্রন্থস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৭
দ্বিতীয় প্রকাশ : যুলকা'দা ১৪৩৩
আশ্বিন ১৪১৯
অকটোবর ২০১২

প্রচ্ছদ গোলাম মাওলা

মুদ্রণ আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় : বিশ টাকা মাত্র

Namaz Qayem Karo Written by Prof. Mohammad Mosharraf Hossain & Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 First Edition November 2007 Second Edition october 2012 Price Taka 20.00 only.

www.amarboi.org

কৈফিয়ত

'নামায কায়েম কর' -কথাটি আল্লাহর নির্দেশঃ اَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ -এর বাংলা অনুবাদ। اَقِيْمُوْا শব্দের অর্থ 'কায়েম কর'। এটা মু'মিন বান্দাহদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ, –আল্লাহর অনুরোধ নয়। সুতরায় বিনয়ের ভাষায় বা অনুরোধের সুরে 'নামায কায়েম করুন' বলা বা লিখা হলে আল্লাহর নির্দেশটির অর্থ বিকৃত করা হবে।

[এই পুস্তিকার উপ-শিরোনাম, 'রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার সাথে নামাযের সম্পর্ক' দেখা যেতে পারে।]

আল্লাহ তা'আলার উক্ত নির্দেশের প্রেক্ষিতে পুস্তিকাটির নামকরণ করা হয়েছে 'নামায কায়েম কর'।

লেখক

www.amarboi.org

সূচীপত্র

❖ **নামায কায়েম কর** ৫

❖ **নামায কায়েমের জন্য আবশ্যকীয় পাঁচটি বিষয়** ৬

এক. নামাযের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে কিভাবে ৬

দুই. নামায আদায়ে কী কী কাজ করতে হয় ৭

তিন. নামায আদায়কালে যা যা বলতে হয় ৮

চার. নামায আদায়কালে মনের অবস্থা কেমন থাকতে হয় ১৩

পাঁচ. ব্যক্তির জীবনে ও সমাজে নামাযের প্রভাব কিরূপ হবে ১৯

❖ **রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার সাথে নামাযের সম্পর্ক** ২২

❖ **আল-কুরআনে নামাযী সমাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য** ২৫

❖ **পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের উপরও নামায কায়েমের নির্দেশ ছিল** ... ২৮

❖ **শেষ কথা** ৩০

www.amarboi.org

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمـٰنِ الرَّحِيْمِ

নামায কায়েম কর

আল্লাহ তা'আলা সকল ঈমানদারকে নির্দেশ দিয়েছেন, اَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ তোমরা ছালাত (নামায) কায়েম কর। 'নামায কায়েম করা' আর 'নামায পড়া' কি এক কথা? যদি তা না হয়, তাহলে আমাদের জানতে হবে কিভাবে নামায কায়েম করা যায়। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা করেছিলেন কিভাবে, আর তাঁর সাহাবীগণ বিশেষ করে খুলাফায়ে রাশেদীন (রা) এ বিষয়ে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসরণ করেছিলেন কিভাবে?

কালিমা তাইয়্যেবার মাধ্যমে আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথেই নামায আদায়ের হুকুম বর্তায়। আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ মেনে নেবার চুক্তিবদ্ধ হবার সাথে সাথে নামায পালনের হুকুম পালন অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। হাদীসের শিক্ষা অনুযায়ী নামাযের সাথে ঈমানের সম্পর্ক এমন দৃঢ়তার সাথে জড়িত যে নামায ছাড়া ঈমানের অস্তিত্বই থাকে না। ঠিক যেমন করে অক্সিজেন ছাড়া মানবসহ যমীনে বিচরণশীল কোন প্রাণীর জীবিত থাকার কথা কল্পনা করা যায় না।

নামায কায়েম করার নির্দেশ পালনের জন্য প্রধানতঃ পাঁচটি বিষয়ের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে ঃ

এক. আমরা নামাযের জন্য কিভাবে প্রস্তুত থাকবো?

দুই. আমরা নামায আদায়কালে কী কী কাজ করব?

তিন. নামায আদায়কালে আমরা মুখে কী কী বলব?

চার. নামায আদায়কালে আমরা যা করব আর যা বলব, তার সাথে আমাদের মনের সম্পর্ক কেমন থাকবে?

পাঁচ. আমাদের বাস্তব জীবনে নামাযের প্রভাব থাকবে কিরূপ?

উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দিয়ে, এগুলোর পুরো হক আদায় করেই নামায কায়েম করার নির্দেশ যথার্থভাবে পালন করা সম্ভব হতে পারে। জেনে রাখা দরকার নামায পড়া আর নামায কায়েম করা কখনও এক কথা নয়। আল্লাহ নামায পড়তে বলেননি কোথাও– সর্বত্রই বলেছেন নামায কায়েম করতে; এমনকি পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের উম্মাতদের প্রতিও নির্দেশ ছিল নামায কায়েম করার।

www.amarboi.org

নামায কায়েমের জন্য আবশ্যকীয় পাঁচটি বিষয়

এক. নামাযের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে কিভাবে

নামাযের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের কয়েকটি দিক হলো ঃ

১. নামাযের নিয়ম-কানুন জেনে নেওয়া। সূরা আল ফাতিহা এবং অন্ততঃ চারটি সূরা সহীহ্-শুদ্ধ করে তিলাওয়াত শিখে নেওয়া।

২. সর্বদা শরীর পবিত্র রাখা। পরিধেয় সকল পোশাক সর্বাবস্থায় পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতি দৃষ্টি রাখা।

৩. নামাযের ওয়াক্তের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা। আউয়াল ওয়াক্তে নামায আদায় করার জন্য তৈরি থাকা।

৪. জামা'আতের সাথে নামায আদায় করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা। আযানের পর বিশেষতঃ জুমু'আর আযানের পর সকল প্রকার কাজকর্ম থেকে বিরত হয়ে নামাযের জন্য প্রস্তুত হওয়া। নামাযের দিকে ধাবিত হওয়া।

৫. ওযু ও গোসলের ফরয কাজগুলো অত্যন্ত সতর্কতা সহকারে আদায় করা। বিশেষতঃ ঝর্ণায় বা ট্যাপে গোসল করার সময় শরীরের সর্বত্র পানি পৌঁছানো। নখ বড় না রাখা, নখে নখপালিশ ব্যবহার না করা, নখপালিশ ব্যবহারকারীগণের ওযু-গোসল কিছুই শুদ্ধ হবেনা। ফলে নামায-তিলাওয়াত ইত্যাদির সাওয়াবের পরিবর্তে আযাব ভোগ করতে হবে। রিং এর নিচে, নাভীতে ও কানের প্রত্যেক মোড়ে পানি পৌঁছানো।

৬. এক ওয়াক্ত নামায আদায় করার পর পরবর্তী নামাযের ওয়াক্তের ইন্তিযারে থাকা। কোন কাজ যেন নামাযীকে তার নামাযের ওয়াক্ত ভুলিয়ে দিতে না পারে, তৎপ্রতি খেয়াল রাখা। খুব গুরুত্বসহকারে নামায আদায় করা।

৭. অন্য সকল কাজের চাইতে নামাযকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া। ঈমান টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে যথাযথভাবে নামায আদায় করা অপরিহার্য। ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের মধ্যে প্রথম স্তম্ভ হলো 'আকাঈদ অর্থাৎ তাওহীদী বিশ্বাস স্থাপন। অতঃপর অবিলম্বে নামায আদায়ে যত্নবান হওয়া।

৮. পেশাব-পায়খানা শেষে সতর্কতার সাথে পবিত্রতা হাসিল করা। বিশেষতঃ পুরুষগণ পেশাব থেকে অতি সাবধানে পবিত্র হওয়া। রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ব্যাপারে খুব সাবধান করেছেন। তিনি বলেছেন–

www.amarboi.org

اِسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ–

'তোমরা পেশাব থেকে পবিত্রতা হাসিল কর, কারণ অধিকাংশ কবর আযাব এই পেশাবের কারণেই হয়ে থাকে।' (সুনান আদ্ দারা কুতনী, খ-১, পৃ-১২৮, হাদীস-৭)

পেশাব-পায়খানার বেগ নিয়ে নামায আদায় করা মাকরূহ। দেহ-মন পবিত্র করে প্রশান্ত চিত্তে নামাযে দাঁড়াতে হবে।

৯. নামাযের নিয়্যাত করার বা দাঁড়ানোর সময় মন থেকে নামায ছাড়া অন্য সব চিন্তা দূরীভূত করা। মনকে সবকিছু থেকে ফিরিয়ে এনে কেবল নামাযের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করা। মাওলায়ে কারীমকে হাযির-নাযির জেনে নামায শুরু করা। প্রকৃতপক্ষে নামাযে বান্দা তার রবের সাথে কথোপকথন করে থাকে। সে সর্বদ্রষ্টা ও সর্বজ্ঞ মুনিবের সামনে নিজেকে সমর্পণ করে থাকে।

দুই. নামায আদায়ে কী কী কাজ করতে হয়

১. কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর মাথা কানের লতি পর্যন্ত উত্তোলন করা। এমতাবস্থায় উভয় হাতের তালু কিবলামুখী রাখা এবং বাম হাত নিচে রেখে ডান হাত তার উপরে রাখা এবং ডান হাতের বৃদ্ধা এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলি দিয়ে বাম হাতের কবজি শক্ত করে ধারণ করা। হস্তদ্বয় বুকের উপর, নাভীর নিচে অথবা নাভীর উপর রাখারও নিয়ম আছে। দাঁড়ানো অবস্থায় নজর সাজদার স্থানে নিবদ্ধ রাখা।

২. রুকুতে গিয়ে উভয় হাতের অঙ্গুলিগুলো ফাঁক ফাঁক রেখে হাঁটুকে এমনভাবে ধরা যেন নামাযীর ঘাড় ও কোমর বরাবর থাকে।

৩. রুকু থেকে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাসবীহ্ পড়ার পর সাজদায় যাবে।

৪. সাজদায় যেতে প্রথমে হাঁটুদ্বয় বিছানায় রাখবে, তারপর হস্তদ্বয় কিংবা প্রথমে হস্তদ্বয় তারপর হাঁটুদ্বয়, অতঃপর যথাক্রমে নাক ও কপাল রাখবে। সাজদায় হাঁটু থেকে হাত দু'খানা পর্যাপ্ত পরিমাণ দূরে রেখে ফাঁক রাখবে। সাজদার শেষে উঠার সময় প্রথমে কপাল, তারপর নাক তারপর হস্তদ্বয় এবং সর্বশেষে হাঁটুদ্বয় বিছানা থেকে উপরে তুলবে।

৫. এভাবে দ্বিতীয় রাক'আত শেষ করে বসবে। ডান পা খাড়া রেখে বাম পা

www.amarboi.org

বিছিয়ে তার উপর বসবে। বসবে এতমীনান বা মনের প্রশান্তি নিয়ে। আর যখন যা পড়বে তা পড়বে গভীর মনোযোগ সহকারে।

৬. তিন রাক'আত বিশিষ্ট নামায হলে দু'রাক'আতের পর তাশাহ্হুদ পড়ে আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়িয়ে যাবে। পূর্বের অনুরূপ তৃতীয় রাক'আত সমাপ্ত করে বসে পড়বে। তাশাহ্হুদ ও দু'আ মাছুরা পড়ার পর সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে।

৭. চার রাক'আত বিশিষ্ট নামায হলে তৃতীয় রাক'আত শেষে না বসে দাঁড়িয়ে গিয়ে যথা নিয়মে চতুর্থ রাক'আত শেষ করে বসে পড়বে, আর তাশাহ্হুদ, দুরূদ ও দু'আ মাছুরা শেষ করে সালাম ফেরাবে। দু'দিকে দু'সালাম। এভাবে দুই, তিন ও চার রাক'আত বিশিষ্ট নামায শেষ করবে।

৮. জামা'আতে নামায আদায়ের সময় ইমামের সাথে তাকবীরগুলো বলবে। এবং সংশ্লিষ্ট তাসবীহগুলো পড়বে।

তিন. নামায আদায়কালে যা যা বলতে হয়

১. তাকবীরে তাহরীমা اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে হাত দু'খানা বাঁধবে। এখানে তাকবীর মানে শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ ও মহিমা ঘোষণা করা, আর তাহরীমা মানে হারাম করে দেয়া। অর্থাৎ নামায শুরুর আগ পর্যন্ত যা যা হালাল ছিল তাকবীর বলে হাত বাঁধার সাথে সাথে কেবল নামাযের কাজ, কথা (পড়া) ও চিন্তা ছাড়া বাকী সবই হারাম হয়ে গেল। এমনকি যা ছিল সাওয়াবের কাজ, যেমন সালাম দেয়া, দেখে দেখে আল কুরআন তিলাওয়াত করা ইত্যাদি- এই তাকবীর বলার সাথে সাথে তাও হারাম হয়ে গেল। এখন এসব করলে সাওয়াব তো দূরের কথা নামাযই ফাসেদ হয়ে যাবে।

২. অতঃপর ছানা পাঠ করবে, যাতে আল্লাহর মহিমা সংক্রান্ত শব্দাবলী উচ্চারণ করা হয়।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ

"হে আল্লাহ! মহা পবিত্র তুমি, প্রশংসা কেবল তোমারই। বরকতময় তোমার নাম, বুলন্দ তোমার যশ-খ্যাতি, তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।"

তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা হিসেবে কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত আয়াতটিও পড়তেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

www.amarboi.org

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

"আমি ফিরিয়ে নিলাম আমার দেহ-মনকে একনিষ্ঠভাবে সেই সত্তার দিকে যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশসমূহ ও পৃথিবী, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।" (সূরা আল আন'আম, আয়াত-৭৯)

৩. তারপর পড়বে সূরা আল ফাতিহা। এর রয়েছে সাতটি আয়াত।

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الرَّحْمـٰنِ الرَّحِيْمِ مَـالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

"সকল প্রশংসা আল্লাহর– জগতসমূহের রব-এর। যিনি করুনাময় পরম দয়ালু। বিচার দিনের মালিক।"

প্রথম এই তিনটি আয়াতে আল্লাহর তাওহীদ, তাঁর ছানা-সিফাত ও প্রতিপত্তির কথা স্বীকার করা হয়েছে। তিনটি বাক্যেই আল্লাহর গুণগান করা হয়েছে তাঁকে তৃতীয় পুরুষ (غَائِبْ) শব্দ দিয়ে। পরবর্তী চারটি আয়াতে তাঁকে দ্বিতীয় পুরুষ (حَاضِرْ) শব্দ দিয়ে সম্বোধন করা হয়েছে।

চতুর্থ আয়াত অর্থাৎ সমান মধ্যভাগের আয়াতটি থেকে আল্লাহকে হাযির রেখে কথা শুরু করা হয়েছে, বলা হয়েছে– إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ আমরা কেবল তোমারই 'ইবাদাত করি আর কেবল তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। এখানে نَعْبُدُ এবং نَسْتَعِيْنُ শব্দ দুটো বর্তমান ও ভবিষ্যত দুটো কালকে অন্ত ভুক্ত করে। অর্থাৎ হে আল্লাহ! যিনি এতসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের মালিক, তুমিতো আমাদের সম্মুখেই আছ। আমরা যাবতীয় দাসত্ব ও আনুগত্য করছি ও করব একমাত্র তোমারই, আর যে কোন প্রয়োজনে সাহায্য প্রার্থনা করছি ও করব কেবল তোমারই কাছে। অন্য কথায় হে রব! আমরা এই নামাযের মধ্যে যেমন তোমারই 'ইবাদাত করছি, আনুগত্য করছি, নামাযের বাইরে গিয়েও কেবল তোমারই আনুগত্য ও দাসত্ব করব, তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি ও নামাযের বাইরে গিয়েও করতে থাকব। আমরা কখনও অন্য কারো আনুগত্য করব না। আর তুমি ছাড়া কারো কাছে সাহায্যও চাইব না।

সূরা আল ফাতিহার এটি হচ্ছে মধ্যম আয়াত। আগের তিনটি আয়াতে আল্লাহর গুণ, সম্মান ও মর্যাদার কথা স্বীকার করা হয় আর পরবর্তী তিনটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলার কাছে সিরাতুল মুস্তাকীম দেখানোর বরং আল্লাহর

www.amarboi.org

সন্তুষ্টি ও জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার আবেদন করা হয়। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে যে, বান্দাহর সূরা আল ফাতিহা তিলাওয়াতের সময় আল্লাহ তার প্রত্যেকটি কথার জবাব দিয়ে থাকেন। প্রথম তিনটি আয়াতের জবাবে (যথাক্রমে) আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাহ আমার প্রশংসা করেছে, আমার সানা-সিফাত বর্ণনা করেছে, আমার মর্যাদা ব্যক্ত করেছে। আর এই মধ্যম আয়াত তিলাওয়াত করলে জবাবে রাব্বুল 'আলামীন বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে এজমালী বিষয়; আর আমার বান্দাহ যা চায় তা-ই সে পাবে। বান্দা যখন শেষ তিনটি আয়াত তিলাওয়াত করে, আল্লাহ তখন বলেন, এটা আমার বান্দার জন্য, আর আমার বান্দাহ যা চায় তা-ই সে পাবে।

হাদীস শরীফে সূরা আল ফাতিহাকে 'উম্মুল কুরআন' মানে 'আল কুরআনের মূল' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মানব জীবনে এই সূরাটির গুরুত্ব এত বেশি যে, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রত্যেক রাক'আতেই এই সূরা তিলাওয়াত করা আবশ্যকীয় করে দেয়া হয়েছে। নামাযে 'আব্দ (বান্দা) ও মা'বূদ (আল্লাহ)-এর মাঝে সরাসরি কথোপকথন হয়। সূরা আল ফাতিহা মূলতঃ আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপন ও সম্পর্ক সুদৃঢ় করার মাধ্যমস্বরূপ।

৪. অতঃপর কুরআন শরীফের যে কোন স্থান থেকে একটি সূরা বা কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করবে। আর তাতে থাকে তাওহীদ, রিসালাত বা আখিরাতের কোন বিষয় অথবা এতদসংক্রান্ত কোন নজীর বা ঘটনা প্রবাহ। এতে বান্দাদের জন্য থাকে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা। যাতে করে তারা তাদের দুনিয়ার জীবনে কল্যাণ ও আখিরাতের জীবনে নিশ্চিত শান্তি ও মুক্তি পেতে পারে।

৫. তারপর দু'হাতের আঙ্গুল ফাঁক ফাঁক রেখে দু'হাঁটুকে ধরে রুকু করবে। রুকুতে মুসল্লির ঘাড় ও কোমর থাকবে বরাবর। তখন রুকুর তাসবীহ তিনবার পড়বে ঃ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ (পবিত্র আমার মহান রব-প্রতিপালক)।

অতঃপর সোজা হয়ে দাঁড়াবে سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (আল্লাহ শুনেছেন যে তাঁর প্রশংসা করেছে) বলে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে ربنا ولك الحمد (হে আমাদের রব, আপনারই জন্য সকল প্রশংসা)। তারপর সাজদায় যাবে اَللهُ اَكْبَرُ(আল্লাহ মহান) বলে। সাজদায় যেতে হবে পূর্বে বর্ণিত নিয়মে। সাজদার তাসবীহ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى (পবিত্র আমার রব, যিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতার মালিক) তিনবার বলতে হয়।

www.amarboi.org

৬. নামাযের আকৃতি বা বাহ্যিক সুরতও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রধানতঃ তিনটি অবস্থার আলোচনা অতীব গুরুত্ব রাখে। প্রথমতঃ মুসল্লি কিবলামুখী হয়ে দু'হাত নাভির উপরে কিংবা নিচে অথবা বুকের উপর বেঁধে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে একাগ্রচিত্তে দাঁড়িয়ে সূরা আল ফাতিহা ও কিরাআত পড়ে। এমতাবস্থায় মুসল্লি কায়মনোবাক্যে তার রবের প্রশংসা ও গুন-গান করে থাকে। দাঁড়িয়ে তার রবকে সম্মান জানিয়ে সূরা আল ফাতিহা ও আয়াতে কুরআনীর মাধ্যমে পরস্পরের কথোপকথনের পরে দ্বিতীয় পর্যায়ে মুসল্লি মাথা নত করে রুকুতে গিয়ে তার বিনয়ের বাস্তব রূপ প্রদর্শন করে থাকে। আর তার রবের মহত্ব প্রকাশ করে নিজের হীনতা প্রকাশে মাথাটা রবের সম্মুখেই নত করে দিয়ে থাকে। তৃতীয় পর্যায়ে রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه বলে দাঁড়িয়ে রবের প্রশংসা করতে থাকে। তারপর اَللهُ اَكْبَرُ। বলে সাজদায় গিয়ে সে প্রমাণ করে যে কেবল মাথা নয়, বরং পুরো দেহ-মন মহান রব আল্লাহর সম্মুখেই নত করে দিতে সে প্রস্তুত। এভাবে মুসল্লি তার নিজের দু'হাঁটু, দু'হাত ও নাক এবং কপাল যমীনে রেখে বিনয়ের চরম পারাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে আর বলে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى এভাবে কেবল একটি সাজদা নয় বরং আরেকটি সাজদা করতে হয়। অর্থাৎ তার পুরো সত্তাই মহান রাব্বুল 'আলামীনের জন্য কুরবান হোক– এটাই তার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

৭. রাতের শেষ নামায হিসেবে পড়তে হয় বিতর। বিত্‌র নামাযের শেষ রাক'আতে পড়তে হয় দু'আয়ে কুনূত ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ–

"হে আল্লাহ! আমরা তোমার সাহায্য কামনা করছি, তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি, তোমাতে ঈমান আনছি, তোমার উপর ভরসা করছি, তোমার উত্তম গুণগান করছি, তোমার শুকর আদায় করছি, কখনও তোমার না-শুকরী করছি না। তোমার সাথে যারা নাফরমানি করে আমরা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছি আর তাদের পরিত্যাগ করে চলছি। হে আল্লাহ! আমরা শুধু তোমারই 'ইবাদাত করি আর তোমারই জন্য নামায আদায় করি,

www.amarboi.org

তোমাকেই সাজদা করি আর তোমারই দিকে ছুটে চলি। তোমার আদেশ পালনে তৈরি থাকি আর তোমার রাহমাত পেতে চাই। আমরা তোমার শাস্তিকে ভয় করি। নিশ্চয়ই তোমার শাস্তি অকৃতজ্ঞ-অবিশ্বাসীদের ঘিরে ফেলবে।"

দু'আয়ে কুনূত হিসেবে উপরোক্ত দু'আটি ছাড়াও আরো অনেক দু'আ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পড়তেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

এভাবে আমরা নামাযে আল্লাহর সাথে কথা বলি এবং ওয়াদা করে থাকি। কী বলি বা কী ওয়াদা করি তা বুঝে শুনে করাই মু'মিনের কর্তব্য।

৮. এভাবে যে কোন নামায দু'রাক'আত শেষে বসে হাঁটুর উপরে হাত রেখে পড়তে হয় ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوتُ وَالطَّيِّبَاتُ- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ-

"যাবতীয় সম্মান, সকল 'ইবাদাত, সমস্ত পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর সালাম আর আল্লাহর রাহমাত বর্ষিত হোক। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর, আর আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া ইলাহ্ নেই, আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দাহ ও রাসূল।"

৯. আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর দরূদ পড়তে হয় এভাবে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

"হে আল্লাহ! তুমি রাহমাত বর্ষণ কর, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর; যেভাবে তুমি রাহমাত বর্ষণ করেছিলে ইবরাহীম (আ)-এর উপর ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি বরকত নাযিল কর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর তাঁর

www.amarboi.org

পরিবার-পরিজনের উপর; যেভাবে তুমি বরকত নাযিল করেছিলে ইবরাহীম (আ)-এর উপর ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত।"

১০. অতঃপর দু'আ মাছুরা পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْ حَمْنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

"হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অনেক যুল্‌ম করেছি। অথচ তুমি ছাড়া গুনাহ মাফ করার আর কেউ নেই। সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর, ক্ষমাতো কেবল তোমারই পক্ষ থেকে হতে পারে। আর আমার প্রতি রাহমাত বর্ষণ কর, নিশ্চয়ই তুমি বড়ই ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।"

চার. নামায আদায়কালে (যা করা হয় আর যা বলা হয়, তাতে মুসল্লীর) মনের অবস্থা কেমন থাকতে হয়

আমরা নামাযে যে কিয়াম, রুকু-সাজদা ও কু'উদ করে থাকি এবং প্রত্যেক স্তরে যা কিছু পড়ে থাকি– এসব অবস্থায় মন কেমন থাকে, কিভাবে কোথায় থাকে, তা অত্যন্ত গুরুত্ব রাখে। বরং নামাযের হালতে মনের অবস্থা ও বিচরণের উপরই নির্ভর করে নামাযের ফলাফল কেমন হবে। কুরআন ও হাদীসের ভাষায় যাকে বলা হয় 'খুশু-খুযু'। আমরা যাকে 'বিনম্র মনোভাব ও মনের একাগ্রতা (Concentration of mind) বলে থাকি। মনের একাগ্রতা ছাড়া নামায কি প্রকৃত অর্থে আদায় হয়? এমন নামায কি আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে থাকে? এ বিষয়ে প্রত্যেক মুসল্লীরই দৃষ্টি রাখতে হবে। আমি যদি জামা'আতে নামায আদায় করি, ইমামের সাথে রুকু-সাজদা ঠিক মতোই করি, কিন্তু আমার মন দিব্বি ঘুরা-ফিরা করছে অন্য কোথাও, ফলে আমি নামাযীদের কাতারে থাকি ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে নামাযের মধ্যে থাকি না– থাকি অন্য কোথাও। মুখে বলছি- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ 'আমরা কেবল তোমারই 'ইবাদাত করি আর শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।' (সূরা আল ফাতিহা, আয়াত-৪)। অথচ মনটি চলে গেছে দোকানে, কারখানায়, নিজের অফিসে অথবা অন্য কোথাও। এভাবে আল্লাহকে সম্বোধন করে থাকি কিন্তু মনের চোখে তাকিয়ে থাকি অন্য দিকে। এটার উদাহরণ হলো এজলাসে জজ সাহেবের সাথে কথা বলছি, অথচ তাকিয়ে আছি পিছনের কারো দিকে। এভাবে নামাযে আরকান তো আদায় করছি বাহ্যিকতা ঠিক রেখে কিন্তু কী করছি, কী বলছি, কাকে বলছি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই

www.amarboi.org

মোটেও। এ ধরনের নামায সেই মহান রব ও মালিকের দরবারে কবুল হওয়ার আশা করতে পারি কিভাবে? বরং এহেন বে-আদবীর কারণে শাস্তি হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। কারণ এতে করে রাব্বুল 'আলামীনের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপইতো করা হয়ে থাকে বাস্তবে।

সূরা আল মা'উনে নামাযে অবহেলাকারী মুসল্লীদেরই তো সাবধান করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে–

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاؤُوْنَ -

"ওয়াইল– দুর্ভোগ সেসব মুসল্লীর জন্য যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে গাফিল, যারা এতে করে লোক দেখানোর কাজ করে থাকে।" (সূরা আল মা'উন, আয়াত ঃ ৪-৬)

নামাযে মনের একাগ্রতা অত্যন্ত জরুরী। মন তো সর্বত্র ঘুরে-ফিরে বেড়ায়– স্থির থাকেনা কোথাও। তাই মন এদিক-সেদিক চলে যেতেই পারে। মনের এমনিভাবে চলে যাওয়াটা তো গুনাহ্ নয়, চলে গেলে তাকে ফিরিয়ে না আনাটা গুনাহ্।

নামাযে হুদূরে কল্‌ব বা মনের একাগ্রতা ধরে রাখার কতগুলো পদ্ধতি রয়েছে, যেগুলোর অনুসরণে হুদূরে কল্‌ব হাসিল করা সহজ হতে পারে।

ক. আল্লাহকে হাযির-নাযির জেনে-বুঝে নামায এমনভাবে আদায় করা যেন আমি আল্লাহকে দেখছি। আর তাঁর সাথে কথোপকথন করছি। যদি ততটুকু অনুভূতি জাগ্রত না হয়ে থাকে তাহলে অন্তত এ কথা স্মরণে রাখা যে, আল্লাহ আমাকে দেখছেন আমার মনকেও দেখছেন। তিনি দেখছেন যেমন আমার বাহ্যিক দিকগুলো ঠিক তেমনি দেখছেন আমার মন কোথায় আছে, মনের ভেতরে কোন্ চিন্তা বা কথা বিরাজ করছে। কাজেই সেই অন্তর্যামী রাব্বুল 'আলামীনকে সামনে রেখেই তো আমার নামায আদায় করা কর্তব্য। যিনি আমাকে, আমার ভেতর-বাহির সমভাবে অবলোকন করছেন, নিরীক্ষণ করছেন।

আমরা নামাযের শুরুতে আল্লাহর সাথে বলে থাকি–

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

"আমি পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে আমার চেহারাকে ফিরিয়ে নিলাম সেই সত্তার দিকে যিনি আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আর আমি তো মুশরিকদের মধ্যে নই।" (সূরা আল আন'আম, আয়াত-৭৯)

নামাযের শুরুতে মুসল্লীগণ এভাবে দুনিয়ার সকল শক্তি, ব্যক্তি ও ক্ষমতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে একান্তভাবে ও পরিপূর্ণ নিষ্ঠাসহকারে মহান রাব্বুল 'আলামীনের দিকে কায়মনোবাক্যে ফিরিয়ে থাকে। আর স্বীকার করে থাকে যে

www.amarboi.org

তারা ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যারা আল্লাহর সাথে অন্যদের শরীক করে থাকে। অন্যকে মহান ও শ্রেষ্ঠ মনে করে বসে, অন্য কোন শক্তির দাপটে সর্বক্ষণ থাকে ভীত-সন্ত্রস্ত। বরং নামাযের প্রতিটি রুকন আদায় করতে হয় اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহ মহান) বলে। নামাযের মধ্যে তারা শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব ঘোষণা করে রাব্বুল 'আলামীনের। যেন এরই প্রশিক্ষণান্তে মানব সমাজেও তারা আল্লাহর মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার সাধনায় রত হয়ে পড়ে। সূরা আল মুদ্দাসসিরে আল্লাহ তাঁর হাবীব সাইয়্যেদুল মুরসালীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্বোধন করে বলেছেন– وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব প্রতিষ্ঠা কর। বাস্তবে তিনি আল্লাহর মহত্ব প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, যার চূড়ান্ত বিজয় হল মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে। মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা-মদীনায় উত্তোলন করে গেছেন নিরঙ্কুশ তাওহীদের ঝাণ্ডা। তাঁর অবর্তমানে সাহাবায়ে কিরাম বিশেষতঃ আবূ বাকর (রা), 'উমার (রা), 'উসমান (রা) ও 'আলী (রা) আল্লাহর মহত্ব প্রতিষ্ঠার প্রাণপন প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন এবং তাঁরা পৃথিবীতে তাওহীদের ঝাণ্ডা উঁচু করে রেখেছিলেন। তাঁদের অবর্তমানে আজ উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপর সেই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। আর এই দায়িত্ব যথাযথ আঞ্জাম দেয়ার প্রাথমিক প্রশিক্ষণই হল– اَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ তোমরা নামায কায়েম কর– এই নির্দেশ পালনের মধ্য দিয়ে।

খ. নামাযে মনের একাগ্রতা হাসিলের আরেকটি পদ্ধতি হল নামাযের রুকনগুলো একটি আদায়ের সাথে সাথে পরবর্তী রুকনের প্রতি লক্ষ্য রাখা। এভাবে সালাম ফেরানো পর্যন্ত নামাযের ভিতরের প্রতিটি ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা এবং মনকে নামাযের মধ্যকার কাজগুলোর মধ্যে নিবিষ্ট করে রাখা। এতে করে হয়ত সাজদায়ে সাহুর প্রয়োজন হবেনা। মনের একাগ্রতার এটিও একটি পদ্ধতি।

গ. নামাযে পঠিত বিষয়গুলোর অর্থ মনে বসিয়ে নেয়া। পঠিত সূরা আল ফাতিহা, কিরাত, আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ, রুকু-সাজদার তাসবীহ– সবকিছুর অর্থ জেনে নেয়া এবং নামাযে পড়ার সময় সেই অর্থের দিকে খেয়াল রাখা। এটা মাদরাসা শিক্ষিতদের জন্য সহজ হলেও সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতরাও একটু মনোযোগ দিলে সুন্দরভাবে বুঝতে পারবেন ও এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারবেন। আজকাল কুরআনের বহু তাফসীর বাংলা করা হয়েছে বিধায়– 'আমরা মাদরাসায় পড়িনি'– এই অজুহাত মোটেই গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। অভাব শুধু সুদৃঢ় মনোবল ও উদ্যোগ গ্রহণের ঈমানী শক্তি।

এ প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। সূরা আল ফাতিহার বিষয় তো ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এখানে শুধু সূরাটির মধ্যম আয়াত

www.amarboi.org

'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তা'ঈনু' পুনরায় বুঝে নিতে চাই। এ কথায় আমরা আল্লাহকে সরাসরি সামনে রেখেই ওয়াদা করে থাকি যে নামাযে রত থাকা অবস্থায় যেমন শুধু তোমারই 'ইবাদাত করি আর তোমারই সাহায্য কামনা করি, ঠিক নামায থেকে বেরিয়ে গিয়ে 'ইবাদাত করব শুধু তোমারই আর সাহায্য চাইব কেবল তোমারই কাছে– আর কারো আইন মেনে চলব না, কারো নিঃশর্ত আনুগত্য করব না, কাউকে ভয় করব না ইত্যাদি। মোটকথা 'ইবাদাত আর ইস্তি 'আনাত বা সাহায্য– এর মালিক একমাত্র তুমি আল্লাহ, আর কেউ নয়। এভাবে প্রত্যেক নামাযের প্রতি রাক'আতেই নামাযীগণ আল্লাহর সাথে ওয়াদা করে থাকেন।

সূরা আল ফতিহার শেষাংশে আমরা বলি–

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ.

"আমাদেরকে সরল পথ দেখাও বা সরল পথে পরিচালিত কর– তাদের পথ যাদের তুমি নি'আমত দিয়েছ; তাদের পথ নয় যাদের উপর তোমার গযব পড়েছে আর যারা পথহারা।"

এখানে মানব সমাজের যারা আল্লাহর নি'আমতপ্রাপ্ত সেসব নবী-রাসূল, সিদ্দীকীন, শহীদান ও সালেহীনের পথে চালানোর প্রার্থনা করা হয় আল্লাহর কাছে। পক্ষান্তরে আল্লাহর গযবপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্টদের পথ থেকে দূরে রাখার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা হয়ে থাকে। আল কুরআন ইয়াহূদীদের ব্যাপারে বলেছে– وَبَاؤُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ (তারা আল্লাহর গযবে নিপতিত হয়েছে) আর খৃস্টানদের ব্যাপারেও তাদের ভ্রষ্টতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। তারা তো তিন খোদায় বিশ্বাসী, তারা 'ঈসাকে (আ) বলে আল্লাহর বেটা যেমন ইয়াহূদীরা উযাইরকে বলে আল্লাহর বেটা। এ ব্যাপারে আল কুরআনে ইরশাদ করা হয়েছে–

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللهِ

"ইয়াহূদীরা বলে, 'উযাইর (আ) আল্লাহর ছেলে আর খৃস্টানরা বলে 'ঈসা মসীহ (আ) আল্লাহর ছেলে।" (সূরা আত্‌ তাওবা, আয়াত-৩০) (না'উজু বিল্লাহ)।

মোটকথা সূরা আল ফাতিহা তিলাওয়াতের মাধ্যমে প্রত্যেক রাক'আতেই একজন মুসল্লী আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলে যে আমাকে নবী-রাসূলগণের পথে চলার আর ইয়াহূদী-খৃস্টানদের পথ থেকে দূরে থাকার তাওফীক দান কর। কিন্তু

www.amarboi.org

বাস্তব জীবনে সেই মুসল্লী ব্যক্তিটিই ওদেরকে অনুসরণ করে চলে, ওদের ভয়ে সারাক্ষণ প্রকম্পিত থাকে, ওদের সাহায্য কামনা করে। আচার-আচারণ, কৃষ্টি-কালচার, তাহযীব-তামাদ্দুন ইত্যাকার ব্যাপারে এই নামাযীরাই তাদের অনুসরণ করছে। ইসলামের শিক্ষা হল সকল মানুষের উপকার করা, কল্যাণ করা। এমনকি আত্মীয়-স্বজনের মত অমুসলিম প্রতিবেশীকেও মানবিক কারণে সাহায্য-সহানুভূতি প্রদর্শন করা। কিন্তু তাদের আদর্শের অনুসরণ করে শির্কে লিপ্ত হওয়া তো একজন মুসলিমের কাজ হতে পারেনা। বরং এমনটি করলে মানব সমাজেরই ক্ষতি করা হয়ে থাকে। আর সেজন্য আল কুরআনের সূরা আল ফাতিহায় ওদের পথ থেকে দূরে থাকতে প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে।

দিনের সর্বশেষ নামায ছালাতুল 'ইশা। আর এই 'ইশার নামাযের শেষে আমরা আদায় করি ছালাতুল বিত্‌র। এর শেষ রাক'আতে দু'আ কুনূতে আল্লাহর সাথে আমরা নামাযীরা অনেকগুলো ওয়াদা করে থাকি। আমরা বলি–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ-

"হে আল্লাহ! আমরা তোমার সাহায্য কামনা করছি, তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি, তোমাতে ঈমান আনছি, তোমার উপর ভরসা করছি, তোমার উত্তম গুণগান করছি, তোমার শোকর আদায় করছি, কখনও তোমার না-শুক্‌রী করছি না। তোমার সাথে যারা নাফরমানি করে আমরা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছি আর তাদের পরিত্যাগ করে চলছি। হে আল্লাহ! আমরা শুধু তোমারই 'ইবাদাত করি আর তোমারই জন্য নামায আদায় করি, তোমাকেই সাজদা করি আর তোমারই দিকে ছুটে চলি। তোমার আদেশ পালনে তৈরি থাকি আর তোমার রাহমাত পেতে চাই। আমরা তোমার শাস্তিকে ভয় করি। নিশ্চয়ই তোমার শাস্তি অকৃতজ্ঞ-অবিশ্বাসীদের ঘিরে ফেলবে।"

ছালাতুল বিত্‌র এর শেষ রাক'আতের শেষভাগে আমরা মুসল্লীরা আল্লাহর সাথে এই সব দু'আ ও ওয়াদা করে থাকি। কিন্তু বাস্তবে কি আমরা বুঝে-শুনে যথার্থভাবে এসব ওয়াদা পূরণ করে চলি? এখানে একপর্যায়ে আল্লাহর নাফরমানদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ওয়াদা করি। কিন্তু নামায থেকে বেরিয়ে

www.amarboi.org

গিয়েই সমাজের একটা কট্টর নাস্তিক আল্লাহদ্রোহী মানবতার দুশমনকে আল্লাহর আসনে সমাসীন করে বসি– যা সুস্পষ্ট শির্‌কেরই অন্তর্ভুক্ত। তাই ছালাত বা নামায কায়েম করতে হলে নামাযের মধ্যে খুশু-খুযু ও হুদূরে কলবের তথা মনের একাগ্রতার সাথে সাথে ওয়াদাকৃত এসব বিষয়গুলোর প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। অন্যথায় নামায পরিণত হবে অনুষ্ঠান-সর্বস্ব 'ইবাদাতে। আল্লাহর নির্দেশ اَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ (নামায কায়েম কর) কিছুতেই বাস্তবায়িত হতে পারে না।

ঘ. নামাযে মনের এতাগ্রতা হাসিল বা হুদূরে কলব হাসিলের জন্য আরেকটি পদ্ধতি হলো নামাযের সবকিছুর রেকর্ড হচ্ছে বলে মনে করা। নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালনা, মুখের পাঠ আর মনের উপস্থিতির সমাহারের কথা কল্পনায় আনা। যেমন কোন মুসল্লী শুরু থেকে নামাযের সকল হক আদায় করে নামায আদায় করছিল হঠাৎ করে 'মালিকি ইয়াওমিদ দীন' তিলাওয়াতের সময় মনে জাগলো, আমার রুমের আলমিরার তালাটা কি বন্ধ করে এসেছি? –তাহলে তার নামাযের রেকর্ডের এই পর্যায়ে এসে একটি তালার ছবি অংকিত হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যাবে হাশরের মাঠে। পরবর্তীতে পূনরায় যখন মন নামাযে ফিরে আসলো, তখন আবার নামায যথাযথভাবে অংকিত ও চিত্রিত হতে থাকলো। কেবল মধ্যে একটি তালা পড়ে থাকলো। সুতরাং পুরো নামাযেই আল্লাহর ধ্যান বা পঠিত আয়াতাংশের মর্ম উপলব্ধি করা নামায কায়েম করার জন্য আবশ্যক। অবশ্য এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা দরকার যে কল্‌ব বা মন তো এদিক-সেদিক দৌড়াতেই পারে। মন অনত্র চলে যাওয়া দোষণীয় নয়, কিন্তু মনকে ফিরিয়ে নিয়ে না আসাটা নামাযের জন্য ক্ষতির কারণ। সুতরাং মনটা অন্যত্র চলে গেলে সহসাই তাকে ফিরিয়ে এনে রাব্বুল 'আলামীনের সম্মুখে হাজির করে দিতে হবে। এভাবে নামাযী সার্বক্ষণিক আল্লাহ তা'আলার উপস্থিতি ও তাঁর দেখার কথা স্মরণে জাগরুক রাখার চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যাবে। আল্লাহর নবীর ভাষায়–

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاه فَاِنَّهُ يَرَاكَ–

"তুমি আল্লাহর 'ইবাদাত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ, যদিওবা তুমি না দেখে থাক, তবে তিনি তো নিশ্চিতই তোমাকে দেখছেন।"

কোন কোন নামাযীর মনের একাগ্রতা হাসিলের জন্য এ পদ্ধতি কাজে আসতে পারে।

ঙ. নিজের নামাযকে 'জীবন্ত নামায' রূপে আল্লাহর দরবারে পৌঁছানোর বাসনা রেখেও নামাযে হুদূরে কল্‌ব হাসিল করা যেতে পারে। প্রথমতঃ নামাযে উঠা-বসা, রুকু-সাজদা করার বাহ্যিক দিকটাকে যদি নামাযের পোশাকতুল্য মনে করা

www.amarboi.org

যায়, দ্বিতীয়তঃ সূরা-কিরা'আত, তাসবীহ্-তাহলীলকে যদি নামাযের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলে ধরা যায়, তৃতীয়তঃ মনের একাগ্রতাকে বা হুদূরে কল্‌বকে যদি নামাযের রূহ হিসেবে গণ্য করা যায় তাহলে এই তিনটি বিষয় নিয়েই হবে পূর্ণাঙ্গ নামায বা জীবন্ত নামায। এখন কেউ যদি নামাযের উঠা-বসা ও রুকু-সাজদা ঠিক মতই আদায় করলো, কিন্তু সূরা-কিরাআত ভুল পড়লো, তাহলে তার নামাযের পোশাক-পরিচ্ছদ ঠিক থাকলেও নামাযটা হলো অঙ্গহীন বা বিকলাঙ্গ। এই বিকলাঙ্গ নামাযকে আল্লাহর দরবারে পেশ করা হলে তার নামায তার কী কাজে আসবে? আবার ধরুন একজন মুসল্লী নামাযের কিয়াম-কু'উদ, রুকু-সাজদা ঠিক মতই করলো এবং কিরাআত-দু'আও ঠিক মতই আদায় করলো কিন্তু নামাযে তার মনটা বাইরের বহু স্থানে ঘুরাফিরা করলো– মনটাকে সে নামাযের মধ্যে এনে আল্লাহর সামনে হাজির রাখতে পারলো না, তাহলে তো তার নামাযের বেশ-ভূষা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুশ্রী হলেও তা হলো রুহ ছাড়া বা প্রাণবিহীন মৃত নামায। এরূপ নামায সেদিন ঐ মুসল্লীর কি কাজে লাগতে পারে?

চ. মানুষের দুনিয়ার জীবন কত বছর কতদিন– তার কোন নিশ্চিত হিসাব নেই। কারো জানা নেই তার মৃত্যুর দিনক্ষণ। সুতরাং একজন নামাযী মনে করবে এই নামায হয়তো আমার জীবনের শেষ নামায। পরবর্তী ওয়াক্ত নামায আদায় করার আমার সময় নাও হতে পারে। কাজেই এই নামায জীবনের শেষ নামায বিধায় নামাযের হুকুক আদায় করে নামায শেষ করা দরকার। প্রয়োজন মনের একাগ্রতা সহকারে নামায আদায় করা। এ ব্যাপারে একটি হাদীস সরাসরি নির্দেশ দিয়েছে এভাবে–

اِذَا قُمْتَ فِيْ صَلٰوتِكَ فَصَلِّ صَلٰوةَ مُوَدِّعٍ

রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন তুমি নামাযে দাঁড়াবে তখন সেই নামাযকে জীবনের শেষ নামায মনে করে আদায় করবে।" (মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবাহ, খ. ৭, পৃ. ২৩২, হাদীস নং ৩৫৫৯১)

মানুষ মাত্রই মরণশীল। মৃত্যুর কথা স্মরণ হলে মানুষের মনে একটা পবিত্রভাব ফুটে ওঠে। দুনিয়াতে অবদান রেখে যাওয়ার জন্য চাই রাব্বুল 'আলামীনের সন্তোষ লাভের আশা, যাতে মু'মিনের জীবনে আনন্দের সঞ্চার হয়ে থাকে।

পাঁচ. ব্যক্তির জীবনে ও সমাজে নামাযের প্রভাব কিরূপ হবে

ক. ব্যক্তির জীবনে নামাযের প্রভাব

নামাযীর ব্যক্তিগত জীবনে নামাযের একটা বিশেষ প্রভাব থাকবে অবশ্যই।

www.amarboi.org

তেমনিভাবে নামাযীগণ যে সমাজে বসবাস করবে সে সমাজেও থাকবে সমাজবাসীর নামাযের এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব।

একজন নামাযী ব্যক্তির কথা, কাজ, আচার-ব্যবহার, লেনদেন, স্বভাব-চরিত্র হবে সম্পূর্ণ পবিত্র ও সুন্দর। তিনি মিথ্যা কথা বলবেন না, কারো হক নষ্ট করবেন না, কারো মনে আঘাত দিবেন না, ইয়াতিম-অসহায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করবেন, নিজের সর্বস্ব দিয়ে হলেও মাতা-পিতার সেবাযত্ন করবেন, ভাই-বোনের হক দিতে কুণ্ঠিত হবেন না, ধোঁকা-প্রতারণা তার কাছে থাকবে না, তার কথা ও কাজে কখনও গরমিল থাকবে না, ওয়াদা রক্ষায় তিনি থাকবেন সদাসচেতন, সমাজের যুল্ম-অত্যাচার তিনি রুখে দাঁড়াবেন, সবল অত্যাচারী থেকে দুর্বল মাযলুমের হক আদায় করে দিতে তিনি থাকবেন সক্রিয় এবং তাঁর চরিত্র হবে নির্মল মধুর। আল্লাহ্ তা'আলা নামাযের প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন–

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

"নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও নিষিদ্ধ (ক্ষতিকর) কাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আল 'আনকাবুত, আয়াত-৪৫)

একজন নামাযীকে তার নামায প্রতারণা-প্রবঞ্চনা ও আত্মসাৎ থেকে ফিরিয়ে রাখে। তিনি সাধ্যমত দীন-দুঃখীদের উপকার করে থাকেন। সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা তার দ্বারা কখনও বিঘ্নিত হয় না। একজন সত্যিকার নামাযী জানে যে তার জান-মাল ও সন্তান-সন্ততি তার কাছে আল্লাহর আমানাত। তিনি নিজে এসবের মালিক নন বরং আমানাতদার। একজন নামাযী আল কুরআন ও সুন্নাহকে নিজের চলার পথের দিশারীরূপে গ্রহণ করে থাকেন। দুনিয়ার পাওনাই যে চূড়ান্ত নয়– একজন ঈমানদার নামাযীর কাছে তা সুস্পষ্ট। কোটি টাকার বিনিময়ে তিনি আল্লাহর নাফরমানীর কোন কাজ করতে পারেন না। তিনি জীবন দেবেন কিন্তু ঈমান ছাড়বেন না। তিনি আল্লাহর কাছে ফিরে গিয়ে জীবনের ছোট-বড় সব কিছুর হিসেব দিতে হবে বলে ভালভাবেই জানেন। তাই দুনিয়ার কোন মোহ তাঁর আদর্শ থেকে তাঁকে এতটুকুও বিচ্যুত করতে পারেনা।

খ. সমাজ জীবনে নামাযের প্রভাব

ইসলাম এমন কোন ধর্ম নয় যে ব্যক্তিগতভাবে কতিপয় কাজ করলেই ইসলাম পালন হয়ে গেল, সমাজ বা রাষ্ট্রের সাথে এর তেমন কোন সম্পর্ক থাকবে না। মূলতঃ ইসলাম মানব সমাজে প্রচলিত অন্য ক'টি ধর্মের মত কোন ধর্মের নাম নয়। কারণ অন্য সব ধর্ম হলো কতগুলো কাজের সমষ্টির নাম। কিন্তু ইসলাম

www.amarboi.org

কতগুলো কাজের সমষ্টির নাম নয়, বরং এ হচ্ছে মানুষের জন্য আল্লাহর দেয়া 'জীবন বিধান' (Way of life) এর নাম। কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে সর্বপ্রথম তার উপর যে কাজটি অপরিহার্য হয়ে থাকে তা হলো নামায (الصَّلٰوةَ)। এই নামায সর্বপ্রথম প্রচলিত হয়েছে জামা'আতের সাথে। সুতরাং নামাযের প্রকৃত রূপই হচ্ছে এটা আদায় করতে হবে একা নয়, বরং জামা'আত বদ্ধভাবে। বিশেষ কোন বিরূপ পরিস্থিতি ছাড়া ইসলামে একা একা নামায আদায়ের কোন বিধান নেই। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জামা'আতে নামায আদায়ের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

নামায প্রত্যেক ঈমানদার নারী-পুরুষের উপর ফরয বা একান্ত কর্তব্য। কেবল মহিলাদের বিশেষ কিছু সময় ছাড়া আর কারো জন্য নামায কখনো বাদ দেয়ার কোন অবকাশ নেই। এমনকি যুদ্ধের মাঠে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও নামায আদায় করার শার'ঈ বিধান রয়েছে। মুসলিম সমাজের কোন ঈমানদার বেনামাযী থাকার কোন বিধান নেই। বরং মুসলিম সমাজে কোন শার'ঈ উযর ছাড়া কেউ নামায তরক করলে শারী'আতের ইমামগণ কুরআন-হাদীসের আলোকে তাদের জন্য তিন ধরনের শাস্তির যে কোনটি প্রয়োগ করার বিধান দিয়েছেন। এক. স্বেচ্ছায় নামায তরককারীকে তাওবা করে নামাযী হওয়া পর্যন্ত জেলে রাখতে হবে। দুই. বেনামাযীকে ৮০টি কোড়া লাগাতে হবে। তিন. তাকে হত্যা করতে হবে। কারণ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বিনা উযরে নামায ছেড়ে দিল, সে তো কুফরী করলো। আল্লাহর নবী বলেছেন–

مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ–

"যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নামায ছেড়ে দিল সে তো কুফরী করলো।" (আল মু'জামুল আউসাত, খ.৩, পৃ. ৩৪৩, হাদীস নং ৩৩৪৮)

মুসলিম সমাজে নামাযের সামগ্রিক চিত্র এসব বিধান থেকে সম্যক উপলব্ধি করা যায়। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে ইমামগণের উক্ত তিনটি মতামতই কোন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা সম্পাদিত হতে পারে না। বরং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাই শুধু এসব শাস্তি বিধান করতে পারে, কোন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে তা সম্ভবও নয়, বিধেয়ও নয়। বস্তুতঃ নামায কায়েম করতে হলে নামাযের এসব সামগ্রিক অবস্থা কার্যকর থাকতে হবে। অন্যথায় নামায কায়েম হয়েছে বলে ধরা যাবে না।

আল্লাহর নির্দেশ নামায কায়েম কর (اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ) এটা সমাজের কোন ব্যক্তি বিশেষকে দিয়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়– সেজন্য প্রয়োজন গোটা সমাজের ভূমিকা। এটা একটা প্রমাণ যে ইসলামী বিধানাবলী কোন ব্যক্তি বিশেষের মাধ্যমে

www.amarboi.org

প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। কথাটা এমন সব লোকদের বোধগম্যের বাইরেই থেকে যাবে যারা ইসলামকে কথিত অন্য ক'টি ধর্মের মত একটা ধর্ম মাত্র মনে করে থাকে। প্রকৃত পক্ষে ইসলাম ওসব অর্থে কোন ধর্ম নয় মোটেই। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর স্থলাভিষিক্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামল এ কথার যথার্থ সাক্ষী। আমাদের উচিত হবে ইসলামের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন কেবল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তদীয় খলীফাগণ– আবূ বাকর (রা), 'উমার (রা), 'উসমান (রা) ও 'আলী (রা) থেকে বুঝে নেয়া। তাঁরা যেভাবে দীন ইসলাম প্রচার-প্রতিষ্ঠা করে গেছেন কেবলমাত্র তাঁদের পথে চলেই প্রকৃত মুসলিম হওয়া সম্ভব। তাঁরা সমাজ বা রাষ্ট্র থেকে পৃথক হয়ে দীন কায়েম করতে পারেননি।

রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার সাথে নামাযের সম্পর্ক

আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের কার্যক্রমের বর্ণনা দিতে গিয়ে সূরা আল হাজ্জ এর ৪১ নং আয়াতে বলেছেন–

الَّذِيْنَ إِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوْا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.

"আমি তাদেরকে পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিলে তারা তাদের ক্ষমতাকে ব্যবহার করবে এভাবে যে– তারা নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাতের ব্যবস্থা সুদৃঢ় করবে, সৎকাজের প্রবর্তন করবে এবং মন্দ কাজের পথ রুদ্ধ করবে।"

খুলাফায়ে রাশেদীন এ সুসংবাদের যোগ্য পাত্র ছিলেন এবং তাঁদের আমলে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় এসব সৎকাজ ভাল ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রখ্যাত তাফসীরবিদ যাহ্‌হাক বলেন, এই আয়াতে তাদের জন্য নির্দেশ রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন করেন। ক্ষমতাসীন থাকাকালে তাঁদের এমন সব কর্ম আনজাম দেয়া উচিত যেগুলো খুলাফায়ে রাশেদীন তাঁদের যামানায় আনজাম দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছাড়া আয়াতে বর্ণিত চারটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আনজাম দেয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

প্রথমতঃ 'ইকামাতুছ ছালাত' বা নামায কায়েম করা। সমাজ ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছাড়া এক বা একাধিক ব্যক্তি কেবল নামাযের পজিটিভ দিকগুলো তথা

www.amarboi.org

নামাযের আরকান-আহকামসহ অন্যান্য হুকুক আদায় করে নামায আদায় করতে পারে মাত্র। হুদূরে কল্‌ব বা খুশু-খুযুসহ নামায পড়তে পারে। কিন্তু নামাযের নেগেটিভ দিকগুলো, যেমন কেউ যদি স্বেচ্ছায় বিনা উযরে নামায তরক করে তাহলে পূর্বোল্লেখিত শরী'আতি বিধান কার্যকর করবে কারা? যদি ইসলামী রাষ্ট্রীয় বিধানই না থাকলো তাহলে বেনামাযীর শাস্তি জেলে দেয়া– তাওবা করা পর্যন্ত বেত্রাঘাত দেয়া অথবা কতল করা– ইত্যাদি বিধান জারি করবে কে, যদি শার'ঈ আইন চালু না থাকে? আর সে অবস্থায় ইকামাতুছ ছালাত বা নামায কায়েম হবে কিভাবে? তেমনিভাবে আল কুরআনের সকল বিধান যেমন ঃ চোরের হাত কাটা, যিনাকারকে রজম করা বা একশত বেত্রাঘাত দেয়া ইত্যাদির বাস্তবায়ন হবে কার মাধ্যমে? যাকাত ব্যবস্থা চালু করা, মদ-সুদ হারাম করার বিধান কার্যকর করবে কে?

আয়াতের দ্বিতীয় বিষয় যাকাতের সুদৃঢ় ব্যবস্থা কায়েম করার ইসলামী বিধান তো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একমাত্র রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। আল কুরআনের বাণী অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় শক্তি ধনীদের থেকে যাকাত তুলে এনে নিঃস্ব-দরিদ্রজনের মধ্যে বিতরণ করবে।

এভাবে ইসলামী জীবন বিধানের দুটো অতি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ ছালাত ও যাকাত-এর পুরো ব্যবস্থাটাই এগুলোর মূলনীতি থেকে বহু দূরে সরে থাকার ফলে মুসলিমদের সমাজ ইসলামী জীবন সৌন্দর্যের স্বরূপ হারিয়ে মারাত্মক সামাজিক তথা জাতীয় সমস্যার অপ্রতিরোধ্য ব্যাধিতে জর্জরিত হয়ে পড়েছে।

আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় ও চতুর্থ বিষয় 'আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার' অর্থাৎ সমাজে ভাল কাজের নির্দেশদান ও মন্দ কাজের প্রতিরোধ করা। মু'মিনদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে নামায ও যাকাতের ন্যায় আমর বিল মা'রূফ আর নাহি আনিল মুনকার থেকে আজকের মুসলিম উম্মাহ অপরিচিত হয়ে পড়েছে। বরং ইসলামী জীবন বিধানের অন্যান্য মৌলিক 'ইবাদাতের পরিভাষার ন্যায় এ দুটো পরিভাষাকেও তারা বেমালুম ভুলে গেছে। এ দুটো পরিভাষার তরজমায় যা আমল চালু হচ্ছে তা হলো– সৎকাজের জন্য অনুরোধ করা আর অসৎ কাজ থেকে দূরে থাকার নসিহত করা। অথচ এ দুটো পরিভাষার অর্থ ছিলো ন্যায় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দান, আর অন্যায় প্রতিরোধের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

এ বিষয়ে আবুল বারাকাত 'আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন মাহমুদ নসফী তাঁর কিতাব আল মানারে 'আমর' امر ও 'নাহি' نهى পরিভাষাদ্বয়ের অত্যন্ত সুন্দর ও যথার্থ সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি আমর اَلْاَمْرُ শব্দের সংজ্ঞায় বলেছেন–

www.amarboi.org

هُوَ قَوْلُ الْقَائِلِ لِغَيْرِهِ عَلَى سَبِيْلِ الْاِسْتِعْلَاءِ اِفْعَلْ

'আমর' أَمْرٌ হলো কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি ক্ষমতা প্রয়োগসহ অন্যদের বলবেন 'এ কাজ কর'। অর্থাৎ তিনি যেন বললেন, এ কাজ অবশ্যই করতে হবে, অন্যথায় শাস্তি পেতে হবে।
তেমনি نَهْى 'নাহি' শব্দের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে–

هُوَ قَوْلُ الْقَائِلِ لَغَيْرِهِ عَلَى سَبِيْلِ الْاِسْتِعْلَاءِ لَا تَفْعَلْ

'নাহি' نَهْى হলো কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বল প্রয়োগ করে অন্যদের বলবেন 'এ কাজ করোনা'। অর্থাৎ তিনি যেন বললেন, এ কাজটি করো না, করলে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে।
মানব সমাজে যারা দীন ইসলাম কবুল করেছে তারা ইসলামের সকল বিধান মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। ইসলামী আইনসমূহ তাদের জন্য অপরিহার্য। ইসলামী সমাজে অমুসলিম অধিবাসীদের কথা ভিন্ন। তারা তাদের ধর্ম পালন করবে। তবে সামাজিক ন্যায় ও শৃঙ্খলা সম্পর্কিত বিধানের বেলায় রাষ্ট্রের আনুগত্য করা তাদের কর্তব্য।
মুসলিম উম্মাহ অবশ্যই 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নাহি আনিল মুনকার'-এর দায়িত্ব পালন করবে, আর মুসলিম জনতাকে হুবহু তা অনুসরণ করতে হবে। নামায মুসল্লীদের 'আমর বিল মারূফ' ও 'নাহি আনিল মুনকার'-এর দায়িত্ব পালনে বাধ্য করে থাকে। অবশ্য সমাজের দায়িত্বশীলগণ এ ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকবেন। কোন নামাযী সমাজে তথা মুসলিম এলাকায় কোন মুসলিম যেমন বেনামাযী থাকতে পারে না তেমনি সেখানে সচরাচর কোন অন্যায়-অসৎ কাজও সংঘটিত হতে পারে না। মূলতঃ একটি নামাযী সোসাইটির এটিই বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে। আর ইকামাতুছ ছালাত বা নামায কায়েমের অর্থ বলতে এটাকেই বুঝায়।
মোটকথা, একটি মুসলিম সমাজের সামগ্রিক অবস্থা থাকবে এমন যে এখানে কোন ব্যক্তি অন্যায় ও অসৎ কাজ করার সাহসই পাবেনা। কখনও কোন অসৎ প্রকৃতির লোক কোন যুল্ম-অত্যাচার করতে চাইলেও সে তার সুযোগটা পেতে সমস্যার সম্মুখীন হবে। হাদীসের শিক্ষানুসারে ও আল কুরআনের নির্দেশনানুযায়ী 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নাহি আনিল মুনকার' একজন ঈমানদার ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য কাজ, হাদীসে তো এমনও বলা আছে যে, এ দুটো কাজ বন্ধ করে

www.amarboi.org

দিলে সেই সমাজের লোকদের দু'আ গ্রহণযোগ্য হবে না। আল কুরআনে বনী ইসরাঈল সমাজে এ দুটো কাজ না থাকার কারণে দাউদ ও ঈসা (আ)-এর মুখে লা'নত পেয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে–

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاْ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُوْنَ كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ

"বনী ইসরাঈলের কুফরকারীগণ দাউদ ও 'ঈসা ইবন মারইয়ামের যবানে অভিশপ্ত হয়েছিলো। এটা এ জন্য যে তারা পাপ কাজ করেছিলো আর সীমালঙ্ঘন করেছিলো। তাদের লোকেরা মুনকার (নিষিদ্ধ) কাজে পরস্পরকে বাধা দিত না।" (সূরা আল মায়িদা, আয়াত ঃ ৭৮-৭৯)

আল কুরআনে নামাযী সমাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায ছাড়াও প্রকৃত অর্থে মু'মিনগণ সর্বদা আল্লাহর অনুগত থাকেন ও জীবনটাকে আখিরাত মুখী করে রাখেন। তারা দিবানিশি আল্লাহর 'ইবাদাতে মশগুল থাকেন। দিবাভাগে তো শিক্ষাদান, প্রশিক্ষণ, প্রচার ও জিহাদ ইত্যাদি কাজে রত থাকেন। রাতের পুরো অংশ তারা আরাম আয়েশে না কাটিয়ে রাব্বুল 'আলামীনের সন্তুষ্টি বিধানে রাত্রি জাগরণও করেন। রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন। তাহাজ্জুদ নামায আল্লাহর পক্ষ থেকে কেবল রাসূলে কারীমের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপর অতিরিক্ত নির্দেশ থাকলেও সাহাবায়ে কিরাম এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকামী ব্যক্তিগণও এই তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত ছিলেন। সূরা আল ফুরকানের ৬৪ নং আয়াতে রাহমানের বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا

"আর যারা রাত অতিবাহিত করে তাদের রবের জন্য সাজদাবনত থেকে ও দাঁড়িয়ে থেকে।"

কুরআনুল কারীমের অনেক জায়গায় তাহাজ্জুদগুজার বান্দাদের বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা আস সাজদায় ১৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ

www.amarboi.org

"তাদের পাঁজর (পিঠ) বিছানা থেকে আলাদা থাকে, তারা তাদের রবকে ভয় ও আশা রেখে ডেকে থাকে, আর আমার দেয়া রিয্ক থেকে তারা (আমার পথে) ব্যয় করে।"

এই আয়াতে বান্দাদের জান ও মাল আল্লাহর পথে ব্যয়ের কথা বিবৃত হয়েছে। এভাবেই আল্লাহর একান্ত অনুগত বান্দাহগণ জান-মাল যে আল্লাহরই দান তা বাস্তবে প্রমাণ করে তাদের রবকে ডাকতে থাকে। দুনিয়ার আরাম-আয়েশে রাত কাটিয়ে না দিয়ে আল্লাহর স্মরণে তাহাজ্জুদ নামায আদায়ে অভ্যস্ত থাকে। বস্তুত তাহাজ্জুদ নামায নফল তথা সুন্নাতে নববী হলেও এই নামাযকে আল্লাহ্ তা'আলা নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে অর্পণ করেছিলেন। আর সাহাবায়ে কিরাম ও অন্য নেক ব্যক্তিগণ তাহাজ্জুদ নামাযের প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন। আয়াতে 'তাদের পিঠ বিছানা থেকে আলাদা থাকে' বলে বুঝিয়েছেন যে, রাতের আরাম ত্যাগ করে আল্লাহর ভয়ে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় তারা রাত জেগে যিক্‌রে ইলাহী তথা তাহাজ্জুদ নামাযে আত্মনিয়োগ করে।

একই অর্থে অন্যান্য সূরায়ও আল্লাহ তা'আলা তাহাজ্জুদগুযার বান্দাদের বর্ণনা দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ সূরা আয্ যারিয়াত এর ১৭-১৮ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

"আল্লাহর মুত্তাকী বান্দাগণ রাতের সামান্য অংশই ঘুমাতো, আর শেষ রাতে তারা আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতো।"

মুসল্লীগণ ব্যক্তিগতভাবেও এমন চরিত্র ও মানসিকতার হতো যে তারা আখিরাতের অনন্ত জীবনকে স্মরণ করে সারা রাত গাফিল হয়ে নাক ডেকে ঘুমাতো না। কারণ দুনিয়ার জীবন অতি সামান্য সময়। তাই আখিরাতের আবাদুল আবাদ যিন্দেগীর জন্য দুনিয়ার অস্থায়ী যিন্দেগীতে আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে আল্লাহর দরবারে দু'চোখের পানি ফেলে মাগফিরাত কামনা করতো।

একজন সচেতন মুসল্লী নিজে ও নিজের স্ত্রীকেও শেষ রাতে মা'বুদের দরবারে কান্না-কাটি করতে অভ্যস্ত করে তুলতে পারে। আর এটা হচ্ছে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের অধিক নামায। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ–

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

www.amarboi.org

"তোমার পরিবার-পরিজনকে নামাযের নির্দেশ দাও আর তুমি নিজেও তাতে অবিচল থাকো।" (সূরা তাহা, আয়াত-১৩২)

এ নির্দেশ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। উপদেশের চাইতে দৃষ্টান্তের মূল্য বেশি। আয়াতটিতে বিষয়টি অত্যন্ত সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ নামাযের জন্য নিজের আহল বা পরিজনকে বল আর নিজেও সে ব্যাপারে নিয়মিত ও প্রতিষ্ঠিত থাকো।

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ اَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ 'নামায কায়েম কর'। সর্বস্তরের সচেতন মুসল্লীদের আল্লাহর এই নির্দেশ মনে প্রাণে অনুধাবন করে সার্বিকভাবে তা বাস্তবায়নের প্রতি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। রাসূলের যুগে, খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এবং তারপরেও ইসলামী সমাজে নামায কায়েমের প্রতি মুসলিম সমাজ সচেতন ছিলেন। আজকের যুগেও নামাযের সুফল পেতে হলে নামায কায়েম করার প্রতি সত্যিকারার্থে মনোযোগী হতে হবে। আল্লাহ আহ্কামুল হাকিমীন সর্বকালেই সকল বান্দাদের প্রতি রাবুবিয়াতের হক আদায় করেন। তাঁর বিধান অমোঘ। কেউ তা ব্যতিক্রমের ক্ষমতা রাখে না। যথার্থ অর্থে নামায কায়েম হলে এর ফলাফল প্রাপ্তিতে কোন ব্যতিক্রম হবার নয়। অবশ্য রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগেও মুনাফিকরা ছিল। তারাও প্রকৃত মু'মিনের সাথে জামা'আতে নামায আদায় করতো। এজন্যে আল কুরআন মুনাফিকদের বেনামাযী বলে তিরস্কার করেনি– তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ছিলোনা যে তারা নামাযে হাজির হয়না বা নামায আদায় করে না। বরং তাদের বিষয়ে বলা হয়েছে–

وَإِذَا قَامُوْاْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُوْاْ كُسَالَى يُرَآؤُوْنَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلاَّ قَلِيْلاً

"যখন ওরা নামাযে দাঁড়ায় তখন দাঁড়ায় আলস্যভরে। আসলে তারা মানুষকে দেখায় মাত্র; আল্লাহকে স্মরণ করে একান্তই কম।" (সূরা আন্ নিসা, আয়াত-১৪২)

এখানে মুনাফিকদের নামাযের তিনটি অবস্থার কথা বলা হয়েছে ঃ ১. এরা নামায পড়ে তো অত্যন্ত অলসতার সাথে দাঁড়িয়ে, ২. নামায পড়ে লোক দেখানোর জন্য, ৩. যে নামায আল্লাহর যিক্‌র বা তাঁর স্মরণার্থে আদায় করা উচিত, তৎপ্রতি ওদের ভ্রূক্ষেপই নেই। এ যুগের মুসল্লীদের এ বিষয়টি সামনে রেখে আত্মপর্যালোচনা করা আবশ্যক।

www.amarboi.org

পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের উপরও নামায কায়েমের নির্দেশ ছিল

১. 'ঈসা (আ)-কে কোলে নিয়ে যখন তাঁর আম্মা মারইয়াম লোকালয়ে আসলেন, তখন শিশু 'ঈসা (আ) সমাজের লোকদের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন–

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا وَجَعَلَنِيْ مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا.

"আমি আল্লাহর বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নবী করেছেন, আমি যেখানেই থাকিনা কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন; তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন ছালাত ও যাকাত আদায় করতে।" (সূরা মারইয়াম, আয়াত ঃ ৩০-৩১)

২. মূসা (আ) যখন মাদ্‌ইয়ান থেকে স্ত্রীসহ মিসর যাচ্ছিলেন, পথে রাত হয়ে যায় আর তাঁরা শীতে কষ্ট পেতে থাকেন। হঠাৎ করে তিনি আগুন দেখতে পেয়ে সেদিকে অগ্রসর হলেন। প্রকৃতপক্ষে তা আগুন ছিল না, তা ছিল আল্লাহর নূরের তাজাল্লী। মূসা (আ) সেখানে গেলে আল্লাহ সরাসরি ওহী শুনালেন। ওহীর বাক্যগুলোর মধ্যে একটি বাক্য ছিল আল্লাহর তাওহীদী 'ইবাদাত বিশেষতঃ ছালাত সম্পর্কে। আল্লাহ বললেন–

إِنَّنِيْ أَنَا اللهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِيْ–

"আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। কাজেই আমার 'ইবাদাত কর আর আমার স্মরণার্থে ছালাত (নামায) কায়েম কর।" (সূরা তাহা, আয়াত-১৪)

৩. ইবরাহীমকে (আ) তাঁর ছেলে ইসহাক (আ) এবং পৌত্র ইয়াকুব (আ) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা যে ওহী পাঠিয়েছিলেন তার কিছু অংশের বর্ণনা দিয়ে বলেন–

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِيْنَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُوْنَ

بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوْا لَنَا عَابِدِيْنَ

"আমি ইবরাহীমকে দান করেছিলাম ইসহাক আর পৌত্ররূপে ইয়াকুব, আর সবাইকে করেছিলাম সৎকর্মপরায়ণ এবং তাদের করেছিলাম নেতা আর তারা

www.amarboi.org

আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ দেখাতো। আমি তাদের ওহী করেছিলাম ভাল কাজ করতে, ছালাত (নামায) কায়েম করতে আর যাকাত দিতে। তারা ছিল আমার একান্ত অনুগত।" (সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত ঃ ৭২-৭৩)
৪. সূরা লোকমানে বলা হয়েছে, লোকমান তাঁর পুত্রকে নসিহত করে বলেছেন–

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ

"ওহে ছেলে! ছালাত (নামায) কায়েম কর আর ভালো কাজের নির্দেশ দাও এবং মন্দ কাজে বাধা দাও।" (সূরা লোকমান, আয়াত-১৭)
৫. আল কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ইসমাঈল (আ)-এর কার্যক্রমের বর্ণনা দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন–

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

"সে তো তার পরিবার-পরিজনকে ছালাতের ও যাকাতের নির্দেশ দিত। আর সে ছিল তার প্রতিপালকের সন্তোষভাজন।" (সূরা মারইয়াম, আয়াত-৫৫)
৬. ইবরাহীম (আ) তাঁর পরবর্তী বংশধরদের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করতে গিয়ে বলেছিলেন–

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا
الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ–

"হে আমাদের রব! আমার বংশধরদের কতককে অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের পাশে থাকতে দিলাম। হে আমাদের রব! এজন্যে যে তারা যেন ছালাত (নামায) কায়েম করে। তাই তুমি লোকদের অন্তর ওদের প্রতি অনুরাগী করে দাও।" (সূরা ইবরাহীম, আয়াত-৩৭)
৭. সূরা মারইয়ামের ৪১ নং আয়াত থেকে ৫৮ নং আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা অতি সংক্ষেপে কয়েকজন নবী-রাসূলের কার্যক্রমের সপ্রশংস বর্ণনা দিয়েছেন। বর্ণনা দিয়েছেন- ইবরাহীম (আ), ইসহাক (আ), ইয়াকুব (আ), মূসা (আ), ইসমাঈল (আ), ইদরীস (আ) প্রমুখের।
তাঁদের বর্ণনা দেয়ার পরে তাঁদের অধস্তন বংশের কিছু লোকের দুষ্কর্মের বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوْا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوْا الشَّهَوَاتِ–

www.amarboi.org

"অতঃপর তাদের পরে আসলো অপদার্থ পরবর্তীরা, তারা ছালাত (নামায) নষ্ট করে লালসা পরবশ হয়ে বসলো।" (সূরা মারইয়াম, আয়াত-৫৯)
পূর্বে বর্ণিত সৎকর্মশীল লোক ও তাঁদের সময়কার নবী-রাসূলগণ যাঁদের বর্ণনা উপরে উল্লেখ করা হলো, তাঁদের পরবর্তী বংশধররা তাঁদের সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের ছিলো। এরা ছিলো হতভাগার দল যারা ছালাত ছেড়ে দিল আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো।
উপরোল্লেখিত আয়াতগুলো থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ছালাত বা নামায পূর্ববর্তী মানববংশের জন্যও ফরয ছিলো। অর্থাৎ এ নামায বনি আদমের জন্য অপরিহার্য কাজ। তাছাড়া আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টির মাঝেও রয়েছে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা ও আনুগত্য প্রকাশের বিভিন্ন পদ্ধতি। সূরা আন নূরের ৪১ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

"তুমি কি দেখনা যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবাই এবং উড়ন্ত পাখিরা আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে। ওদের প্রত্যেকের জানা আছে কিভাবে আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করতে হয়। আর আল্লাহ্ ওদের কাজকর্ম ভালোভাবেই জানেন।"
অর্থাৎ কেবল মানুষই আল্লাহর 'ইবাদাত করছে না বরং সকল সৃষ্টিই নিজ নিজ পদ্ধতিতে আল্লাহর তাসবীহ ও ছালাত আদায় করে। আল্লাহ্ 'ছালাত' শব্দটি এখানে ব্যবহার করেছেন সকল জীব ও সৃষ্টির প্রসঙ্গে।

শেষ কথা

দীন ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি– কালেমা, নামায, যাকাত, রোযা ও হাজ্জ। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন যেদিন থেকে প্রথম মানুষ পাঠান, তাঁকে নবী করেই পাঠান। তাইতো পৃথিবীর প্রথম মানুষই প্রথম নবী আদম (আ)। অতঃপর নূহ (আ) থেকে দীনের ক্রম বিকাশ আরম্ভ হয়ে নবুওয়াতের ধারার পূর্ণতা লাভ ও সমাপ্তি ঘটে সাইয়্যেদেনা মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে। আল কুরআনের শিক্ষা থেকে আমরা জানতে পেলাম এই নামায, রোযা, যাকাত ও হাজ্জ পূর্ববর্তী নবীগণের আমল থেকেই চলে এসেছে। আসলে সৃষ্টিকর্তাই ভালো

www.amarboi.org

জানেন যে তাঁর সৃষ্টি ইনসানের জন্য দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের মুক্তি কিসে সম্ভব আর কি কারণেই বা তাদেরকে উভয় জাহানে মহাক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। এজন্য তিনি অতি দয়াপরবশ হয়ে তাঁর অতি আদরের সৃষ্টি মানব জাতির সার্বিক সফলতা ও কল্যাণ যে পথে, সে পথে পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাই যুগে যুগে নবী রাসূলগণের মাধ্যমে করে এসেছেন। সেসব ব্যবস্থার মধ্যে ছালাত বা নামায সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীতে মানব জাতির জন্য ইসলামের শান্তি ও কল্যাণ এবং আখিরাতের জীবনের প্রকৃত সফলতা হাসিলের নিশ্চিত মাধ্যম এই নামায। নামায নামাযীকে সকল প্রকার অশ্লীলতা ও নিষিদ্ধ গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। মানব জীবনের সাথে নামাযের অতি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে বিধায় সকল নবী এবং তাঁদের উম্মাতগণের উপর ছালাত বা নামায কায়েম করা অপরিহার্য ছিলো। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ

"তোমরা আমাকে যেভাবে নামায আদায় করতে দেখ সেভাবে আদায় কর।" (সহীহ্ আল বুখারী, হাদীস-৬৩১)

অতএব, জীবনের অন্যান্য কাজের মত নামায কায়েম করতে হলেও মু'মিনদেরকে অবশ্যই একমাত্র রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শেখানো পদ্ধতিই অনুসরণ করতে হবে। ■

www.amarboi.org

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা